মনে পড়ে

এক স্মরণীয় বিপ্লবী : জীবনতারা হালদার

সুদীপ সেন

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে। ১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মের এক দুপুরে প্রথম আমি তাঁর বাড়িতে যাই। ছোটখাট চেহারার মানুষটিকে দেখে কে বলবে তখন তাঁর বয়স বিরানব্বই বছর! সেই বয়সেও একাকী ট্রামে-বাসে চড়ে কলকাতা শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি প্রখর, ছানি পড়ার কোনও লক্ষণ নেই, এমনকী চশমা ব্যবহার করতেও তাঁকে কোনওদিন দেখিনি। আর মনটা ছিল সহজ সরল ফুর্তিবাজ অল্পবয়স্ক কিশোরের মতো। স্বভাবসুলভ অমায়িকতা আর কৌতুকপ্রিয়তার জন্য মানুষটি ছিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই প্রিয়। অন্তত একবারের জন্যও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই তাঁর মনোহর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছেন।

তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবী জীবনতারা হালদার। যখন তাঁকে প্রথম দেখি, সেসময় আমি কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকের নিয়মিত ফ্রিল্যান্স লেখক। সম্পাদকের প্রস্তাবমতো একদিন তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে যাই। আলাপচারিতার প্রথম দিনে স্বদেশি আন্দোলন ও অগ্নিযুগের বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও কথাবার্তা হয়। তাঁর জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার কথা জেনে বিস্মিত হই। কতদিকেই না উৎসাহ ছিল চিরসতেজ, চিরসবুজ এই মানুষটির। আর গল্প বলার কী চমৎকার ক্ষমতা! তাঁর আকর্ষণে তারপর আরও বেশ কয়েকবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে অমূল্য সঞ্চয় কিছু কিছু বার করে আমাকে তার অংশ দিয়েছেন। আর খাওয়াদাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে তো কথাই নেই। কতরকম মিষ্টির যে গল্প করতেন! তার অনেকগুলিই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রতি বছর প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা কে সি দাশের পরিবার থেকে দোকানের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর নিমন্ত্রণ হত। হেসে বলতেন, ''আমাকে তোমরা ভোজনরসিক বলতে পার, আমি একাদিক্রমে বিগত পঁয়ষট্টি বছর ধরে ওদের বিভিন্ন মিষ্টি টেস্ট করে আসছি।'' আমাকেও একবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কে সি দাশের প্রতিষ্ঠাদিবসে ওঁর ভোজনসঙ্গী হওয়ার। আসলে উনি ছিলেন মিষ্টান্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এবিষয়ে ওঁর লেখা ইংরেজি বই 'ইন্ডিয়ান সুইটস্' তো একসময় সাহেবদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

যে-কোনও বিষয় নিয়ে মুখে মুখে চমৎকার সব ছড়া তৈরি করার আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল তাঁর। আমাকে স্বরচিত বই 'ছড়াকাটা' উপহার দিয়েছিলেন। অজস্র ছড়ায় সমৃদ্ধ বইটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে মানুষটির চমৎকার রসবোধের পরিচয়। শেক্সপিয়র সরণিতে অবস্থিত 'ইনস্টিটিউট অব হিস্টরিকাল স্টাডিজ'-এ মাঝে মাঝে যেতেন। আমি তখন কর্মসূত্রে ওখানকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। একদিন ইনস্টিটিউটের তদানীন্তন ডিরেক্টর বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয়ের ঘরে ঢুকে দেখি জীবনতারা বসে আছেন। অনেক মজার কথা বলছেন আর ঘরে উপবিষ্ট সবাই খুব উপভোগ করছেন। এদিকে আকাশ কখন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। একসময় মুষলধারে বৃষ্টি, সহজে থামতে চায় না। উনি আটকে গেলেন। নিশীথবাবু আমাকে ডেকে বললেন, ''তুমি তো ওদিক দিয়েই ফিরবে, ওঁকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাও তো ভাল হয়।'' বললাম, ''ঠিক আছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, বৃষ্টি থামলে যাওয়া যাবে।'' তারপর আমি আমার কাজ করতে চলে গেলাম। একসময় বৃষ্টিও ধরে গেল। বৃষ্টি থামার কিছুক্ষণ পর স্যারের ঘরে গিয়ে দেখি উনি নেই। স্যারকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, ''উনি তো এইমাত্র চলে গেলেন। যা ছটফটে মানুষ! 'এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে' বলেই উঠে পড়লেন। কারও নিষেধ শুনলেন না।'' যাইহোক, স্যারের কথামতো দৌড়ে ইনস্টিটিউট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দ্রুত পদক্ষেপে বাস স্ট্যান্ডের দিকে অনেকটা হেঁটে গিয়েও তাঁকে দেখতে পেলাম না। ইনস্টিটিউটে ফিরে আসতে আসতে বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে শুধু ভাবছিলাম প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন এই মানুষটির অফুরান প্রাণশক্তির কথা।

সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' ছবিটি করার সময় পুরনো দিনের কলকাতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনার জন্য জীবনতারা হালদারের কাছে গিয়েছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে আমার আগ্রহের কথা শুনে ওঁর ইচ্ছা হয়েছিল কলকাতা শহরের নানা ঐতিহাসিক এলাকা এবং দ্রষ্টব্য বস্তু ঘুরিয়ে দেখাবেন। বলেছিলেন, ''যদি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পার তো খুব ভাল হয়। এমন রাস্তাও এ-শহরে আছে যা দেখলে তাজ্জব বনে যাবে। রাস্তার দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত দুটি বাড়ির বারান্দার মাঝে ফাঁক এত সামান্য যে পাশাপাশি দুজন মানুষের পক্ষে যাতায়াত করাই কষ্টকর।''

কথাপ্রসঙ্গে জীবনতারা হালদার বলেছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের কথা। বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে গত শতাব্দীর একেবারে সূচনায় যতীন্দ্রনাথ বাংলায় চলে আসেন গুপ্তভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করতে। ইনি পরে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। বর্ধমানের খানা জংশনের কাছে খোরে নদীর তীরে চান্নাগ্রামে ছিল তাঁর আশ্রম। হালদার মশাই সেখানে সাত-আট বছর কাল অতিবাহিত করেন। খুব অল্প বয়সে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে সমসাময়িক কালের অনেক বড় বড় নেতার সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু, সংগঠক পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তী কালে এম এন রায়), হরিকুমার চক্রবর্তী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, নলিনী কর, ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের নায়ক জিতেন লাহিড়ী, বোমা বিশারদ লাডলীমোহন মিত্র এবং রসিকলাল দত্তর নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো অতবড় একজন বিপ্লবীকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেছিলেন জীবনতারা। কিশোর বয়সে বিপ্লবীদের চিঠি নিয়ে বহুবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন। বহু

মানুষের চোখেই 'যাদুদা' ছিলেন আদর্শ বিপ্লবী। ছদ্মবেশ ধারণ করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। হালদার মশাইয়ের মুখে শুনি, শরৎচন্দ্র নাকি 'পথের দাবি' উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রটিকে রূপ দেন যাদুদার কথা ভেবেই। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ রাসবিহারী বসুর কথাও বলে থাকেন। আবার কারও কারও অনুমান, কোনও একজন নন, এ-ধরনের বেশ কিছু বিপ্লবীর জীবনধারা ও কাজকর্ম শরৎচন্দ্রের মনে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল—সব্যসাচী চরিত্রটি যার ফলশ্রুতি।

জীবনতারা হালদার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই (২ শ্রাবণ ১৩০০ বঙ্গাব্দ) মধ্য কলকাতার সিমলা অঞ্চলে মাতুলালয়ে। পাঁচ বছর বয়সে নর্মাল স্কুলে তাঁর শিক্ষাপর্বের সূচনা। এই সেই স্কুল যা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও বাল্যকালের শিক্ষাজীবনের স্মৃতিবিজড়িত। সহপাঠী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত জীবনতারা বিধান সরণিতে অবস্থিত ক্ষুদিরাম বসু পরিচালিত সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেখানে থার্ড ক্লাস অবধি অধ্যয়ন করে অতঃপর সেকেন্ড ও ফার্স্ট ক্লাসের পাঠ নেন হিন্দু স্কুলে (১৯০৭-১৯০৯) এবং সেখান থেকেই এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেইসময় প্রথিতযশা রসময় মিত্র ছিলেন হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলজীবন শেষ করে ১৯০৯ সালে জীবনতারা স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। স্কটিশ চার্চ থেকে আই এস সি ও বি এস সি ডিগ্রি লাভের পর ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিওর ম্যাথামেটিক্সে এম এস সি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯০২ সালের ২৮ মার্চ (১০ চৈত্র ১৩০৮ সাল) সোমবার দোলপূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। চারবছর পর যুগান্তর পার্টিও স্থাপিত হয়। জীবনতারা ১৯০৫ সালে বারো বছর বয়সে অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। সত্যেন্দ্রনাথও এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় বিডন স্কোয়ারে বড় বড় নেতারা বক্তৃতা দিতেন। নেতাদের নির্দেশমতো তাঁরা বিলাতি জিনিস পুড়িয়েছেন, আরও অনেকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়েছেন সেই সাড়াজাগানো গান—''মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।'' বোম্বাই মিলের তৈরি মোটা ধুতি কাঁধে করে ফেরি করে বেড়িয়েছেন পথে পথে।

কোন ঘটনা বা অনুপ্রেরণা তাঁকে বিপ্লবীজীবনের পথে আসতে সাহায্য করেছিল আমি জানতে চাওয়ায় জীবনতারা বলেছিলেন, ''আমার সেজমামা যতীন্দ্রনাথ শেঠ অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তখন সমিতি বিশ্বস্ত ও মেধাবী ছাত্র বেছে বেছে রিক্রুট করত। এছাড়া আমার মেজমামা সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ শেঠও স্বদেশি মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সেজমামার জন্যই আমাদের বাড়িতে অনেক বিপ্লবীর যাতায়াত ছিল। তাঁদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সুতরাং একটা স্বদেশি আবহাওয়া—অর্থাৎ পরাধীন দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে এরকম একটা মানসিকতার মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি। বালক বয়সে 'শিবাজী উৎসব' মুখস্থ করে এক সভায় আবৃত্তি করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন ঘরে ঘরে পালিত হল অরন্ধন, বিক্ষুব্ধ জনতা গঙ্গাস্নান সেরে পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিতে লাগল। তখনকার দিনে সব ধরনের রাজনৈতিক তরঙ্গের কেন্দ্রস্থল ছিল বিডন স্কোয়ার

(অধুনা রবীন্দ্রকানন)। সেখান থেকে এক বিরাট মিছিল বার হল। মিছিলের অগ্রভাগে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে চলেছেন ''বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন/ এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।'' মেজমামা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান গেয়ে গঙ্গার দিকে এগোচ্ছেন, পিছনে আমিও অন্যদের সঙ্গে গাইতে গাইতে চলেছি। সেই দিনটার কথা খুব মনে পড়ে, দৃশ্যগুলিকে এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।''

গুপ্ত সমিতিতে জীবনতারার বেশির ভাগ কাজ ছিল দূতের। বোমা, পিস্তল, জরুরি চিঠি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দিতেন—অবশ্যই না জেনে। হয়তো একজন বিপ্লবী নেতা বললেন অমুকের কাছে জুতোর বাক্সটা পৌঁছে দিয়ে আসতে। জুতোর বাক্স নিয়ে চলেছেন অথচ জানেন না ভিতরে কী আছে, বোমা না পিস্তল না অন্য কিছু। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নানা রকম সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা হত। লাঠিখেলা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। উনি তখন নিতান্তই বালক। কত আর বয়স! একদিন লাঠিখেলা শুরু হবে, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অর্থাৎ এম এন রায় ওঁকে বললেন, ''যা শিগগির একটা লাঠি নিয়ে আয়।'' উনি ছুটে গিয়ে একটা সরু বেঁটে লাঠি এনে দিতেই বললেন, ''ধুস! কী লাঠি এনেছিস, আর সবার লাঠি দেখ''—বলেই এক চাঁটি। বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক বসলে জীবনতারা ঘরের বাইরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অচেনা সন্দেহজনক লোকজন আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছে কি না তা লক্ষ রাখতেন। ভগৎ সিং একবার এসেছিলেন বরানগরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) কাছে। সেটা ১৯২৮ সাল। নিরালম্ব স্বামী তখন জীবনতারার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজয় বসাকের বাগানবাড়িতে কিছুদিন ধরে অবস্থান করছেন। ঘরের ভিতর গোপন বৈঠক চলছিল। জীবনতারা প্রহরী ছিলেন পুলিশ আসে কি না লক্ষ রাখবার জন্য। ওই বাড়িতেই দুপুরবেলায় আড্ডার জমাটি আসর বসত। আসরে মাঝে মাঝে দেখা মিলত শরৎ পণ্ডিত (দাদা ঠাকুর), কাজি নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকারের মতন মানুষদের। এখানেই শুনেছিলেন নজরুলের কণ্ঠে গান।

প্রতি রবিবার নীতিশিক্ষার ক্লাস বসত। গীতাপাঠের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া চণ্ডী, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, 'অমিয় নিমাইচরিত', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, মাৎসিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত, ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বই পড়তে হত। এছাড়া ছাত্রজীবনে সমগ্র বাইবেল—ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট এবং কোরানও পাঠ করেছেন। পরবর্তী কালে সংসারজীবনে প্রবেশের পর মূল গদ্যানুবাদে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, আয়ুর্বেদগ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের বই বিশেষ করে আনন্দমঠ, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি পাঠ করেছেন। তাছাড়া নানাবিধ সংবাদপত্র ও বিভিন্ন দেশের সাময়িক পত্র-পত্রিকা তো ছিলই। চতুঃশক্তির (শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক) বিকাশে বিপ্লবীদের কাছে বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বের প্রভাব বা গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি।

অনুশীলন সমিতিতে জীবনতারা ছিলেন ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত। ১৯০৮ সালে সমিতি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পর চার বছর কোনও নাম না দিয়ে বিকল্প অনুশীলন সমিতি চালিয়েছেন। এটি আপাতদৃষ্টিতে ছিল ক্লাব—কুস্তির আখড়া। বিশিষ্ট বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার প্রায়শই আসতেন। কুস্তি শেখানো হত, আবার শরীরচর্চার আড়ালে বিপ্লবী কাজকর্মও চলত। চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কাঁচা অপরিণত মনের কাজ কি না জানতে চাইলে

জীবনতারার স্পষ্টোক্তি : ''হ্যাঁ, কাঁচা মনের কাজ তো বটেই। এসব কাঁচা মনের দ্বারাই সম্ভব—খুব পরিণতবয়স্ক কিংবা বৃদ্ধদের দ্বারা নয়। আমরা যারা বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিলাম তাদের সবারই তখন নিতান্ত কাঁচা বয়স। আমাদের নেতাদের বয়সও আমাদের থেকে এমন কিছু বেশি ছিল না।'' ওঁর মতে, স্বাধীনতা আন্দোলনের 'প্রধান অবদান' নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ এবং সেইসঙ্গে আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা। আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ''আমাদের মস্ত বড় দুর্ভাগ্য যে নেতাজীকে আমরা হারালাম। যদি আর পঞ্চাশ মাইল ভিতরে নেতাজী ঢুকতে পারতেন, সমস্ত দেশ তাঁর পিছনে দাঁড়াত। এত বিভেদ থাকত না, এত রক্তপাত ঘটত না, দেশভাগও হত না। নেতাজী থাকলে ভারতবর্ষের চেহারাই পালটে যেত। আহা, সোনার দেশ হয়ে যেত যদি নেতাজী আসতেন!''

নিজের সাংবাদিকজীবনের কথাপ্রসঙ্গে জীবনতারা বলেন, ওঁর সাংবাদিকজীবনের সূচনা হয় ১৯২৮ সালে। তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গোলাপলাল ঘোষ। ''তাঁর কাছে আমার হাতেখড়ি হয় বলতে পার। তাঁর কথামতো প্রতি সপ্তাহে আমি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে ওই পত্রিকায় এক কলম লিখতাম। এছাড়া আরও অনেক পত্রিকায় লিখেছি। যেমন 'দি এমপ্রেস' নামে সেই সময় বিলেত থেকে একটা হাই ক্লাস ফোর্টনাইটলি বার হত। আমিই একমাত্র ভারতীয় যার লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর লিখেছি লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিশ্ববিখ্যাত উইকলি 'পাঞ্চ' পত্রিকায়। তারপর ধরো বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ম্যাগাজিন, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, মডার্ন রিভিউ, দি ইলাসট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রভৃতি।'' হেসে বলেছিলেন, ''আর একটা খবর তো জান না। চেম্বার্সের-এর টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকশনারিতে 'Baboo' কথার অর্থটা ঠিক লেখা ছিল না, আমি ভুল সংশোধন করিয়েছি।''

বিপ্লবীজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথাও শুনিয়েছিলেন : ''একটা খুব মজাদার অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা বলবার মতো। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হই। প্রথম একমাস জেলে বন্দি অবস্থায় কাটানোর পর প্রায় একবছর অন্তরীণ থাকতে হয় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম থেকে তেরো মাইল উত্তরে বিনপুর গ্রামে। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাস বিলিতি সাহেব। একজন হেড কনস্টেবলকে ডেকে আমায় তার হাতে জমা করে দিয়ে তাকে হুকুম দিলেন বিনপুর থানার দারোগাবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে। হাতে একটা প্রকাণ্ড লেফাফা, বড় বড় হরফে ছাপা 'On His Majesty's Service, Strictly Confidential'। দশটা সিলমোহর দিয়ে শক্ত করে আঁটা। গরুর গাড়ি চড়ে সন্ধ্যা সাতটায় রওনা দিলাম। পরদিন আমাকে দারোগাবাবুর সামনে হাজির করে সেই খামখানা তার হাতে দিল। দারোগাবাবু খামের মুখ ছিঁড়ে সাহেবের হুকুমনামা চিঠিখানা বার করে আমায় পড়তে দিলেন। মানে বুঝিয়ে দিতে বললেন। আমি তো অবাক। দারোগাবাবুকে বললাম, 'সে কী? আমার সম্বন্ধে চিঠি, আপনার ওপর হুকুম, আমার পড়া কি উচিত হবে?' তবুও তিনি আমায় চিঠি পড়ে মানে বুঝিয়ে দিতে বললেন। সেকালের অজ পাড়াগাঁয়ের দারোগা, বাংলা ভাষায় থানার কাজ চালাতেন। যাই হোক, ওতে আমার সম্বন্ধে দশ-বারোটা নির্দেশ ছিল থানার দারোগার ওপর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পনেরো দিন অন্তর আমার গতিবিধি, কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে। বলাবাহুল্য, দারোগাবাবু ইংরেজি

বিশেষ না জানার দরুন ওই পাক্ষিক রিপোর্টও আমাকেই লিখতে হত। অবশ্য তিনি সেটা থানার ছাপা চিঠির কাগজে কপি করে বড় বড় মার্কামারা 'On His Majesty's Service, Strictly Confidential' লেফাফায় পুরতেন। মুখ বন্ধ করে আট-দশটা সিলমোহর দিয়ে সাঁটতেন। কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগে তা জমা হত। প্রায় একবছর ধরে এই প্রহসন চলেছে। নিঃসন্দেহে এটা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ ঘটনা।"

শেষবারের মতো যখন ওঁর বাড়িতে যাই তখন স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ায় বলেছিলেন এমনিতে কোনও অসুবিধা নেই, শুধু কানে কম শুনছেন আর পায়ের জোর কিছুটা কমেছে। পায়ে হেঁটে একাকী যত্রতত্র ভ্রমণে বাড়ির বাইরে বার হয়ে পড়ার ব্যাপারটাও বন্ধ, কারণ বাড়ি থেকেই আপত্তি উঠেছে। তারপর বেশ অনেকদিন ওঁর কাছে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৯০ সালের এক সকালে ঘুম থেকে উঠে সংবাদপত্র মারফত পেলাম সেই দুঃসংবাদ। সর্বজনশ্রদ্ধেয়, বড় সহজ আর কাছের মানুষটি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভাবতে লাগলাম, তাঁর স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্যলাভের যে-সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, তার কতটুকুই বা কাজে লাগাতে পারলাম! তাঁর কাছে আরও কতকিছু পাওয়ার ছিল, জানার ছিল।

তাঁর সান্নিধ্যলাভের দিন কটি আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে মূল্যবান সংযোজন হয়ে রইল—শুধু এইটুকুই যা সান্ত্বনা। ✠

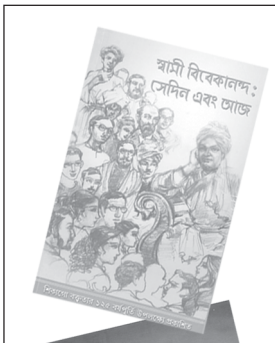

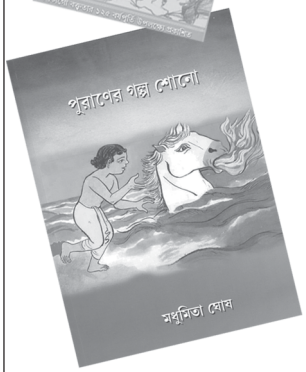

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ সংকলন :

স্বামী বিবেকানন্দ : সেদিন এবং আজ

পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৮, মূল্য : ৯০ টাকা

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতবাসীকে সচেতন করতে। আজ ঘরে ঘরে আমাদের শিশুরা জানুক, পুরাণে কী রত্ন আছে। শিশুর চোখে-মনে জেগে উঠুক অতীতের উপকরণহীন অথচ মহিমময় জীবনের মধুর শান্ত ছন্দ। সেই প্রয়াসেরই ফল **'পুরাণের গল্প শোনো'**। শিশুদের আকর্ষণীয় করে পুরাণের গল্পগুলি পরিবেশন করেছেন অধ্যাপিকা **ড. মধুমিতা ঘোষ**। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি, এঁকেছেন **বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী**।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, মূল্য : ১১০ টাকা